Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 662 - 674
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

চট্টগ্রামের লোকগানের ধারা : স্বরূপ-সন্ধান

হাসনাইন ইস্তেফাজ
প্রভাষক, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : hasnainpavel3@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Chittagong folk songs, Sampan, Karnaphuli, Maizbhandari songs, Kavi songs, Pala songs, Hati Kheda songs,

Abstract
Folk songs in every region of Bangladesh are spontaneous creations of the local mindset of that area. Like other branches of folk creation, the folk songs of Chittagong are born from the local life of this region and are an evolving cultural element shaped by the flow of time.In the folk songs of this region, alongside the collective characteristics of the rural lifestyle, there are various exceptional tendencies for several reasons.Here ,in addition to classical music and kirtan,many diverse streams of music can be observed. In fact, the rich and diverse tradition of folk music has been practiced in this region for nearly one and a half centuries.Therefore , the folk songs of this region are considered a rich tradition of bengali folk music. The present article attempts to present a cronological intruduction to the diverse streams of folk music prevalent in Chittagong.

Discussion

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের লোকগানই সেই অঞ্চলের লোকমানসের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। লোকসৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতোই চট্টগ্রামের লোকগানও এ অঞ্চলের লৌকিক জীবন প্রসূত এবং তা সময়ের স্রোতে বিবর্তিত একটি সাংস্কৃতিক উপাদান। এ অঞ্চলের লোকগানে লোকায়ত জীবনধারার সামূহিক বৈশিষ্ট্যসহ কিছু ব্যতিক্রমী প্রবণতা যুক্ত নানা কারণে। এখানে শাস্ত্রীয় সংগীত ও কীর্তনের পাশাপাশি লোকগানের বহুবিধ ধারা পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত, এখানে লোকগানের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য চর্চিত হয়ে আসছে প্রায় দেড়শত শতাব্দী জুড়ে। তাই এ অঞ্চলের লোকগানকে বাংলা লোকগানের একটি সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে চট্টগ্রামের প্রচলিত লোকগানের বিচিত্রধারার পর্যায়ক্রমিক পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

হাজার বছরের পথ পেরিয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি স্বরূপতায় সমৃদ্ধ বিশ্বের মানচিত্রে চট্টগ্রাম একটি প্রাচীনতম জনপদ। চট্টগ্রামের সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পর্যালোচনা করলে মনে হবে যে, জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচর্চাই চট্টগ্রামের বিশেষত্ব। কিন্তু, এই জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচর্চার একটি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে আছে সংগীত। চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর হওয়ায় অতীতে বিদেশী বণিকদের যাতায়াত ছিল। ভিনদেশী বণিক শাসকদের অপ্রত্যাশিত দখল শাসন ও শোষণ, নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ প্রমুখের আবির্ভাব এখানকার সংস্কৃতিকে সংগীতময় করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

বর্তমান বিশ্বে সংগীত বলতে শিষ্ট সংগীতকে প্রধান্য দিলেও সেই শিষ্ট সংগীতের উৎসমূল লোকগান। লোকগান হলো সেই গান যা মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় নিরক্ষর গ্রামবাসীর কণ্ঠে গীত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বাংলা লোকগানে চট্টগ্রামের বিরাট এক ঐতিহ্য রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের কবি-সাহিত্যিকদের অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। এমনকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ ছিল কতগুলো গান মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, বৈষ্ণবপদাবলী, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানসহ মধ্যযুগের সকল সাহিত্যকর্মই ছিল রাগতাল সমভিব্যবহারে গেয়। কাব্যগানের উৎকর্ষের পরম্পরায় এখানে আধুনিককালের লোকাঙ্গিক গানের বিচিত্র সম্ভার সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

লোকগানের বিভিন্ন ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানষের মুখের ভাষায়। মূলত স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক জীবনধারা, সাগর-নদী বিধৌত জীবনধারা, পাহাড়বেষ্টিত বন্ধুর জীবনপ্রণালী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে চট্টগ্রামের লোকগানের ধারা। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান নদী কিংবা সাগরের অবারিত স্রোতধারার মত, যেখানে ফল্গুধারার মতো এসে মিশেছে স্থানীয় লোকগানের ধারার

পালাগান, বারোমাসি গান, হঅঁলা গান, বিয়ের গান, ফুলপাঠ গান, হালদাফাডা গান, সাম্পানিয়া গীতি, মারফতি গান, মাইজভাণ্ডারী গান, গাইনের পালা বা গাজির গান, কবিগান নামক বিভিন্ন স্রোত। চট্টগ্রামের এসকল গানকে অনেকেই আঞ্চলিক গানও বলে থাকেন। ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে কল্যাণী ঘোষ সম্পাদিত ‘চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান’ নামক একটি গানের সংকলন প্রকাশিত হলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান সারাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। সংকলনটিতে ত্রিশজন গীতিকারের ৩৮১টি গান স্থান পেয়েছে। গানগুলোকে ২০টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের খ্যাতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম চিরস্মরণীয় তাঁরা হলেন -অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, অজিত বরণ শর্মা, এম. এন. আখতার, আবদুল গফুর হালী, আস্কর আলী পন্ডিত, অমলেন্দু বিশ্বাস, ফণী বড়ুয়া, কবিয়াল ইয়াকুব আলী, মলয় ঘোষ দস্তিদার, মোহনলাল দাশ, মোহাম্মদ নাসির, শিমুল শীল, বুলবুল আক্তার, জাহাঙ্গীর আলম, মৃদুল কুমার দে, সুমন চৌধুরী বিকু, শেলী দে, বাবুল আচার্য, প্রতিমা ঘোষ, এস্তফা, অজিফা খানম প্রমুখ। এঁদের অনেকেই কণ্ঠশিল্পী, সুরকার কেউ আবার গীতিকার হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শিল্পী জুটি শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব - শেফালী ঘোষ। শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব - শেফালী জুটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানকে নিয়ে গেছেন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে। পরবর্তীতে সনজিত আচার্য ও কল্যাণী ঘোষ তাঁদের পরবর্তী জুটি হিসেবে আঞ্চলিক গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন মানুষের কাছে। চট্টগ্রামের কিছু জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান –

১. বাইন দুয়ারদি ন'আইসো তুঁই নিশিরও কালে/ মা বাপরে লাগাই দিবো মাইনষে দেখিলে, ২. কইলজার ভিতর গাঁথি রাইখুম তোঁয়ারে, ৩. কর্ণফুলীরে সাক্ষী রাখিলাম তোরে, ৪. মনে তো মানে না, দিলে তো বুঝে না, ৫. মালকা বানুর দেশে রে, ৬. একদিন বুঝিবা জ্যাডা একদিন বুঝিবা, ৭. কী জ্বালা দি গেলা মো রে, ৮. আইচ কাইল আই আইলে এ্যান কা গরর, ৯. নাতিন বরই খা, বরই খা হাতত লইয়া নুন, ১০. মানা গজ্জীলাম তোরে পিরিত ন গরিস, ১১. হেড মাস্টারে তোঁয়ারে তোঁয়ার। জনপ্রিয় এ গানগুলোতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রেম-বিরহ, নর-নারীর সম্পর্ক, সামাজিক নানা অসঙ্গতি, নানা এলাকার লোকসংস্কৃতি, এখানকার নিজস্ব লোকাচার ওঠে এসেছে। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গানগুলোর উপজীব্য শুধু প্রেম, বিরহ ও স্থানীয় জীবনচিত্রই নয়; দেশপ্রেমও রয়েছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এরকম কয়েকটি দেশপ্রেমমূলক গান হল –

‘বাংলাদেশের মুখ হইয়ে যে চাঁটিয়া বন্দর’, ‘লাল সবুজ এ পতাকা আন্নি আঁরা যুদ্ধ গরি’, ‘মার ভাষার লাই পরাণ দিয়ে রফিক, সালাম, বরকত’, ‘পরাণ ভরি শোকর গরি আঁরার চাটগাঁত বসত বাস’, ‘বার আউলিয়া ছিটকাই দিইয়ে রহমতের সুবাস’, ‘কতো দেশ ঘুরিলাম কতো কিছু দেখিলাম চাটগাঁর মতন এন সুন্দরইয়্যা ন দেখিলাম আঁই’ সহ বেশ কিছু গান।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রাম নদীবিধৌত পলিমাটির অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত। মোহনার নদী কর্ণফুলী চট্টগ্রামের প্রাণ বলেই বিবেচিত। চট্টগ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা, প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যেন নিত্যসঙ্গী কর্ণফুলি। কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। শুধু তাই নয়, -

> "এ অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলনের হাজারো স্মৃতি জড়িয়ে আছে কর্ণফুলি, শঙ্খ এবং কক্সবাজারের মাতামুহরী ও বাঁক-খালী নদীকে ঘিরে।"[১]

তাইতো মলয় ঘোষ দস্তিদার কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি বিষয়ক ইতিহাসকে অনুষঙ্গ করে লেখেন অসাধারণ একগান। দৃষ্টান্ত স্বরুপ নিম্নোক্ত গানটিতে কর্ণফুলি নদীর ইতিহাস দেখতে পাই -

"ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত
লুসাই পাহাড়তুন নামিয়ারে
যার গই কর্ণফুলি।...
পাহাড়ি কন সুন্দর মাইয়া
ঢেউর পানিত যাই
সেয়ান করি উডি দেখের
কানের দুল তার নাই
যেইদিন কানের ফুল হাজাইয়ে
হেইদিনত্তুন নাম কর্ণফুলি।"[২]

লোকগানে বিরহী নারীদের হৃদয়াকুতির প্রকাশ লক্ষযোগ্য। সনজিত আচার্যের একটি গানে নদী কর্ণফুলিকে নিয়ে নারী হৃদয়ের আত্মগত ভাবনা, বিরহ ও যাতনার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে -

"ওরে কর্ণফুলিরে সাক্ষী রাখিলাম তোরে
অভাগিনীর দুঃখের কথা-করি বন্ধুরে।
যত তরুলতা-
কার কাছে বুঝাইয়ুম
আঁর মনেরি কথা-
যদি ন পাই বন্ধুরে
আর হুনাইয়ম কারে
...
ইশারা দি ডাইকতো বন্ধু
আঁরে গোপনে
কানে কানে মনর কথা
কইতাম দুইজনে
যাইতাম ঘরের বাইরে
ও তাঁর বাঁশির সুরে॥"[৩]

কর্ণফুলির রূপসুষমায় মুগ্ধ হয়ে অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী কর্ণফুলির ঢেউ, কর্ণফুলির বুকে ভাসমান সাম্পান, নৌকা নিয়ে লিখেছে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী গান। এ গানের মাধ্যমে এখানকার মানুষের সংগ্রামী মনোভাব ও অসাম্প্রাদায়িক চেতনারই প্রকাশ দেখতে পাই -

"চাডগাঁইয়া নওজোয়ান আঁরা
হিন্দু মুসলমান
দৈর্গার কূলত বসত গরি
ঠেগাই ঝড় তুয়ান।
এই দইরগার কূলত বসতগরি
আঁরা বেয়াগুন মিলি রে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঢেউয়ের আঘাত নাচি নাচি
নাও সাম্পান লই খেলি রে
ডর কি আঁরা সিনা দি তাই
ঠেগাই ঝড় তুয়ান।"[৪]

চট্টগ্রামের লোকগানের অন্যতম অনুষঙ্গ 'সাম্পান'। সত্তরের দশকে বিখ্যাত গীতিকার মোহনলাল দাশের রচিত 'ওরে সাম্পান ওয়ালা' গানটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। "সাম্পান মাঝি নিয়ে জনপ্রিয় গানগুলোর বেশিরভাগ লিখেছেন মোহাম্মদ নাসির, অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, মোহন লাল দাশ, কবিয়াল ইয়কুব আলী, এম এন আখতার, আবদুল গফুর হালী, সঞ্জিত আচার্য, সৈয়দ মহিউদ্দিনের মতো সংগীতজ্ঞরা। শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, সঞ্জিত আচার্য, কান্ত নন্দী, বুলবুল আক্তারসহ নাম না জানা অনেক শিল্পী সাম্পান মাঝির গান গেয়েছেন।"[৫] সাম্পানওয়ালার সাথে এ অঞ্চলের নারীর প্রেমানুভূতি ও নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক সত্যিই অবাক করার মতো। বাবরি চুলের সাম্পানওয়ালার অদম্য সাহস, প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ের অফুরান শক্তি আসলেই নারী হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে -

"ও রে সাম্পানওয়ালা-
তুই আমারে করলি দেওয়ানা,
সাম্পানওয়ালার বাবরি চুল
হারি নিল জাতের কুল
সে বিনা মোর পরান বাঁচে না।
কুতুবদিয়া বন্ধুর বাড়ি
বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে নারি
বন্ধু বিনা ঘুম তো আসে না।
বাহার মারি যার গই সাম্পান
ক্ষেণে ভাটি ক্ষেণে উজান
ঝড় তুফানে পরওয়া করে না।"[৬]

বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সঞ্জিত আচার্যের সাম্পান মাঝির গানটি প্রসঙ্গ ক্রমে মনে পড়ে যায়। প্রিয় মানুষের খোঁজে সাম্পান মাঝি যেন কাঙাল হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে আজকে এ-ঘাট তো কালকে ও-ঘাট –

"বাঁশখালী মইশখালী
পাল উড়াইয়া দিলে,
সাম্পান গুরগুরাই টানে
আয় তোরা হন্ হন্ যাবি
কর্ণফুলীর মাঝি আঁই
নিইয়ম ভাটি-উজানে,"[৭]

কবিয়াল এয়াকুব আলী সাম্পান মাঝির বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের শিল্পী শেফালী ঘোষের গাওয়া সেই গানে প্রেম-বিরহের প্রসঙ্গ যেমন ওঠে এসেছে, তেমনি সাম্পান মাঝিদের জীবনের করুণ কথাও জানতে পারা যায় -

"পালে কী রং লাগাইল রে মাঝি
সাম্পানে কী রং লাগাইল
শঙ্খ খালর সাম্পানওয়ালা আঁরে
পাগল বানাইল।"[৮]

সাম্পান এখানকার মানুষের যাপিত জীবনের নিত্যসঙ্গী বলেই সাম্পানমাঝি নিয়ে গান ও নাটক লেখা হয়েছে অসংখ্য। তাছাড়া কক্সবাজার এলাকার মাতামুহুরী ও বাঁকখালী নদীর মাঝি নিয়েও লেখা হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী অনেক গান। এই অঞ্চলের বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার এম এ রশিদ কাওয়াল, আহমেদ কবির আজাদ ও সিরাজুল ইসলাম আজাদের গানগুলো বেশ জনপ্রিয়। আহমেদ কবিরের একটি গান -

"কক্সবাজার দইজ্যার চর
তার উয়রদি পার
দইজ্যার কূলত সাম্পান চলে
হত গম গম লার।
বাঁকখালীর মাঝি অভাই সোনাদিয়া বাসা
মুখখান হালা গইরজ্য কিল্লাই
হনে দিলে তাশারে
ওরে বাঁকখালী মাঝি রে।"[৯]

চট্টগ্রামের লোকগানের ধারায় ঐতিহ্যবাহীআধ্যাত্মিক গান হল মাইজভাণ্ডারী গান। মাইজভাণ্ডারী গান বাংলার লোকসংগীতে এক ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। ৭০ ও ৮০-এর দশক ছিল চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারী গানের স্বর্ণযুগ।

মাইজভাণ্ডারী গানের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারেরও অধিক। যে সকল ভক্ত-কবি মাইজভান্ডারী গান রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন – আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, বজলুল করিম মন্দাকিনী, আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, রমেশ শীল, মনমোহন দত্ত, আব্দুল গফুর হালী, মহিউদ্দীন ভাণ্ডারী প্রমুখ। তবে লোকগানের এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন মাওলানা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী, কবিয়াল রমেশ শীল ও আবদুল গফুর হালী। কবিয়াল রমেশ শীল প্রায় তিন শতাধিক মাইজভাণ্ডারী গান রচনা করেন। তাঁর একটি মাইজভাণ্ডারী গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে যা মানুষের মুখে মুখে আজও ফেরে -

"চল রে মন ত্বরাই যাই, বিলম্বের আর সময় নাই
গাউলছুল আজম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুলেছে।
আবাল বৃদ্ধ নরনারী, করে সবে হুরাহুরি
নাম করে রেজিষ্টারী ভর্তি হইতেছে।
সেই স্কুলের এমনি ধারা, বিচার নাই জোয়ান বুড়া
ছিনায় ছিনায় লিখা পড়া শিক্ষা দিতেছে।
মাষ্টার ও মাহিনা ছাড়া, এলমে লদুনী পড়া
কাগজ কালি দোয়াত কলম কি দরকার আছে?"[১০]

হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতে খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) তাঁর চিশতীয়া তরিকায় সামা'কে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এক বৈপ্লবিক সংস্কৃতির রূপান্তর সাধিত হয় এই ভারতবর্ষে। মাইজভাণ্ডারী গানের উদ্ভবপর্বের গানগুলো সাধন সংগীত হিসেবে সামা মাহফিলে গীত হত, যা ভক্তদের আধ্যাত্মিক জিকির হিসেবে গণ্য হত। মাওলানা হাদীর উদ্ভব-পর্বের একটি গান -

"দমে দমে জপরে মন-লা এলাহা ইল্লাল্লা,
ঘটে ঘটে আছে জারি লা এলাহা-ইল্লাল্লা।
ঘাটের সারেঙ্গী বিছে প্রেম রতনের তার লাগাইছে,
মাওলাজির নাম জপে লা এলাহা ইল্লাল্লা।
সপ্তরঙ্গী টপি বিছে রুহধন কামিনী নাচে,
প্রেমেতে বিভোর জপ লা ইলাহা ইল্লাল্লা।"[১১]

বাংলা সাহিত্যে আঠারো শতকের দিকে কবিগানের আবির্ভাব হয়। যাঁরা কবিগান রচনা করতেন তাঁদেরকে কবিওয়ালা/ কবিয়াল বলা হয়। কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেও কবিগান মৌলিক এবং অলিখিত লোকাঙ্গিক গানের ধারা। কবিগানের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিগানের প্রাচীনতম কবি ছিলেন কবি গোঁজলা গুঁই। এছাড়া ভোলাময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, নিধু বাবু ও দাশরথি রায় কবিয়াল হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। চট্টগ্রামে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিগানের চর্চা ব্যাপক লক্ষ করা যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রগতিশীল বাম পন্থীদের উদ্যোগে চট্টগ্রামেই প্রথম কবিয়ালদের সংগঠিত করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিয়াল গঙ্গাচরণ জলদাস, সুবল ভট্ট, নবীন ঠাকুর, আজগর আলী, মোহন বাঁশি ও হরকুমার শীল চট্টগ্রামে কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কবিগানে আধুনিক চিন্তা ও জাতীয়তাবোধের সম্মিলন ঘটানোর জন্য ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রমেশ শীলকে সভাপতি ও ফণী বড়ুয়াকে সম্পাদক করে 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। চট্টগ্রামে কবিয়াল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম রমেশ শীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমাজবাদী মানুষ কবিয়াল রমেশি শীল গাইলেন -

"দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখানে লোক জাগিল না কেনে।
দিন মজুর ঘরজা যারা, গত সন মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব কেমনে,
মরে গিয়েও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে
অনাহার আর রোগের পীড়নে।
দুইবেলা কেহ খায়না, কেহ কারো পানে চায় না
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুর গনে।"[১২]

চট্টগ্রামে কবিগানে রমেশ শীলের পরেই যাঁর নাম অনিবার্যভাবে ওঠে আসে মণীন্দ্র দাসের নাম। সরকার মণীন্দ্র দাস ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর রচনা করেন '১৯৪৩ সনের কবিতা' নামক কবিগানের একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ নিম্নরূপ-

"১৯৪৩ সনে খাদ্য সঙ্কট হইল
চট্টগ্রামে নরনারী দুই লক্ষ মইলা।
অন্নবিনা পাইয়া কষ্ট অনেকে হয় জাতি ভ্রষ্ট
সতীর সতীত্ব নষ্ট পেটের দায়ে হইল।
মা ছেলে লইয়া কোলে রাস্তায় নিয়ে দিল ফেলে
নিজে মরে ডুবি জলে প্রাণের মায়া গেল।"[১৩]

পালাগান বলতে কাহিনীমূলক লোকগীতিকে বোঝায়। পালাগান প্রধানত পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানভাগ নিয়ে রচিত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পৌরাণিক পালাগান: মান, মাথুর, নৌকাবিলাস, কালীয়দম, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি। চন্দ্রাবতী, মহুয়া, মলুয়া, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, দস্যু কেরামের পালা, ভেলুয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আখ্যানমূলক পালাগান। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালাগানেরও আঙ্গিক এবং বিষয়গত পরিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক ও দেব-দেবীর কাহিনীর পরিবর্তে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা নিয়েও পালাগান রচিত হয়েছে। চট্টগ্রামের সাহিত্যিক আশুতোষ চৌধুরী ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ৭৬টি পালাগান সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ৯টি পালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামের পালা সংকলনে স্থান পায়।

পালাগনের পদকর্তাকে বলা হয় পদকর্তা বা অধিকারী। পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। তিনি দোহারদের সহযোগে গান পরিবেশন করেন। চট্টগ্রামের পালাগানের গায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - সেকান্দার বাইন, অলিয়র রহমান, অজু পাগল, ওমর বৈদ্য, হায়দার আলী, বেলায়েত আলী প্রমুখ। চট্টগ্রামে লোকপ্রিয় অনেক পালা-কাহিনী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রচলিত ছিল। ‘ভেলুয়া-আমির সওদাগর’, ‘কমল সওদাগর’, ‘মলকা-মনু’, ‘কাফনচোরা ডাকু মনসুর’, ‘নসর মালুম ও আমিনা সুন্দরী’, ‘নুরুন্নেহা ও কবরের কথা’ ইত্যাদি এখানকার বিশিষ্ট পালা। ‘নেজাম ডাকাতের পালা’ আশুতোষ চৌধুরী লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর খুব সম্ভবত প্রথম সংগ্রহ। পালাটি তিনি বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত অল্লাগ্রাম নিবাসী সদর আলী গায়েনের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। এটি রচিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক নেজাম ডাকাতকে উপজীব্য করে। পালাটির অংশ বিশেষ -

“ফকির কহিল তুমি কর এক কাম,
ঘরে তোমার মা জননী স্তিরী পুত্র আছে।
এই টাকা লইয়া তুমি যাও তারার কাছে,
রুজি করিয়াছ টাকা অনেক মানুষ কাড়ি।”[১৪]

‘হঁঅলা গান’ চট্টগ্রামের লোকগানের একটি প্রাচীন ধারা। চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে বিয়ে-শাদি, খৎনা, মেয়েদের কর্ণছেদন উপলক্ষে মহিলারা নেচে নেচে একক বা দলবদ্ধভাবে এ গান পরিবেশন করে। তারাই এ গানের রচয়িতা, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাৎক্ষণিক মুখে মুখে এ গান পরিবেশন করে। হঁঅলা সংগীতে নারী মনের ভাবাবেগজাত কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়। চট্টগ্রামের লোকগানে ‘পরীবানুর হঁঅলা’, ‘মলকা-মনুর হঁঅলা’ নামে দু’টি বিখ্যাত হঁঅলা প্রচলিত আছে। পরীবানুর হঁঅলা -

“সাইগরে ডুবালি পরীরে,
হায়! হায় দুখে মরিরে,
বার বাংলার বাদশা সুজা রাজ্যের শেষ নাই
বাপের দিন্যা তক্তের লাগি করিল লড়াই
মার পেডর ভাইরে হৈল কাল পরানের বৈরীরে।
...
নসিবের লেখা কভু না যায় খণ্ডন
চাডিগাঁ ছাড়িতে বাদশা করিল মনন,
দক্ষিণ মিক্যা আইল তারা হাতির পিটে চড়িরে,
সাইগরে ডুবালি পরীরে।”[১৫]

‘রঙ্গুম রঙ্গিলা’ চট্টগ্রামের লোকগানের একটি স্বতন্ত্র ধারা। মায়ানমারের বর্তমান রাজধানী ইয়াঙ্গুনকে চট্টগ্রামের মানুষ ‘রঙ্গুম’, ‘রেঙ্গুন’ বলতো। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানে রেঙ্গুনের প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে ওঠে এসেছে। চট্টগ্রামের লোকজন জীবিকার অন্বেষণে গিয়ে রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থানে চাকরি করতো। বর্মী মেয়েদের একধরনের আকর্ষণীয় নাচ ‘পোনার নাচে’র প্রেমে পড়ে কেউ সেখানে বিয়ে করে ফেলত। ভুলে যেত মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানকে। রেঙ্গুন প্রবাসী পতির বিরহে চট্টগ্রামের নববধূদের বিরহ-গাঁথা লোক মুখে মুখে গীত হত -

“রঙ্গুম রঙ্গিলারে...
রঙ্গুম রঙ্গিলার সনে
মজি হইল মন,
এই মতে ’দেবানা’ হইয়া
রইল কতজন।
রঙ্গুম রঙ্গিলারে।”[১৬]

এ ধারার গানের মধ্যে আবদুল গফুর হালীর ‘ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাওরে’ গানটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই একটি গানেই তৎকালীন সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠেছে। আবদুল গফুর হালীর দাদা সলিম উদ্দিন রেঙ্গুন গিয়ে আর ফিরে আসেননি। দাদির বিরহী হৃদয়ের জীবন-বাস্তবতার নিরিখে এই গানটি রচনা করেন -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 662 - 674
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাওরে
কনে খাইব রেঙ্গুনের কামাই রে,
ও শ্যাম শ্যাম রে
রেঙ্গুনের রেশমি শাড়ি
ন পিন্দিয়োম মুই অবলা নারী রে।
ও শ্যাম রে
ঘরত আছে শীতল পাটি
সুখে রাইখ্যম টাঙায়া মশারি রে।
ও শ্যাম শ্যাম রে
এক মাসের লাই রেঙ্গুন যাইবা-
আর কোনদিন ফিরি ন আইবা রে।
ও শ্যাম শ্যাম রে
রেঙ্গুন যাইব নৌকার চড়ি
ফিরি আইসতে আইসতে
আঁই যাইয়ম গই মরি রে।"[১৭]

'হাতি খেদা' গান চট্টগ্রামের ব্যতিক্রমধর্মী লোকগান। পাহাড় জঙ্গলবেষ্টিত চট্টগ্রামে যখন অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান পাকতে শুরু করে তখন বন্যহাতি লোকালয়ে ঢুকে কৃষকের ফসল, ঘর-বাড়ি নষ্ট করে। হাতি খেদা গানে লোককবিদের দক্ষতা অবাক করার মত। হাতির চরিত্র, আবাসস্থল, চেহারা গতিবিধির যে শৈল্পিক এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা তাঁদের গানে রয়েছে তা লোককবি হিসেবে তাঁদেরই দক্ষতারই পরিচায়ক -

"শুন আচানক কাণ্ড হাতির চরিত্র
এত বড়ো জানোয়ার নাই পৃথিবীতে।
হাতির ঠ্যাং দেখিতে যেমন গুদামের থম
মুড়ার পথত লাগৎ পাইলে হাতি মাইনসের যম।
ডঅর ডঅর কান যেমন দুইয়ান কুলা।
দাতাল হাতির দাঁত দুউয়া মাঘ মাইস্যা মুলা।
ডেঁকির সমান ছোড়তা তার মাথা সদাই হেট
ছোড ছোড চোখ হাতির ডোলর মতন পেট।
কে বুঝিতে পারে ভাইরে হোদার কেরামত॥"[১৮]

'গরু দাগান্যা'র গান হল চট্টগ্রামের লোকগানের আরেক স্বতন্ত্র ধারা। রোগাক্রান্ত গরুর চিকিৎসার জন্য একসময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুর ডাক্তাররা উপস্থিত হতেন। চট্টগ্রামের ভাষায় এদেরকে 'গরু দাগান্যা' বলা হয়। এমনই একজন গরু দাগান্যা আনোয়ারা উপজেলার সোনাইয়া গোয়াইল্যা। তাঁর একটি গান -

"লাগ লাগ লাগ,
তোরে দাগাইলাম জট করি,
তোর রোগ যাইব চট করি।
সোনাইয়া গোয়াইল্যার দাগ,
বন্দে বন্দে লাগ॥"[১৯]

চট্টগ্রামের লোকায়ত জীবনে খরা বা অনাবৃষ্টির ফলে 'বৃষ্টি ডাকার গানে'র উদ্ভব হয় কৃষিভিত্তিক জনপদে। দলবদ্ধ হয়ে ঘরে-ঘরে গিয়ে চাউল তুলতো, আর এই গান সম্মিলিতভাবে গাইতো। বৃষ্টি ডাকার গানের নমুনা -

"আয়রে মেঘনী
ঠেং দুই দুই ফেলা পানি,
কেলা তুলে এক আঁড়ু পানি।
কচুতলে এক গলা পানি
বিবি ফাতেমা খোঁজে পানি
আল্লা তুই দেরে পানি।"[২০]

আবার অতিবৃষ্টি হলে কৃষকেরা রোদের প্রার্থনা করে 'রোদ ডাকার গান' নামে এক ধরনের গানের উদ্ভব করেন। তা নিম্নরূপ-

"রৈতারে রৈধানি, চাঁদার মারে পুতনী,
চাঁদার উর বৈলফুল
ছির ছিরিয়া রৈত উঠ্॥"[২১]

লোকাঙ্গিক সুরে গীত হওয়া 'ঘুম পাড়ানি' ও 'ছেলে ভুলানো' ছড়া চট্টগ্রামের লোকগানকে ভিন্নতা দান করেছে। ঘুম পাড়ানি ও ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির কেন্দ্রে রয়েছে শিশু। ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ঘুম পাড়ানি ছড়া শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। সেকালে সন্তানেরা ঘুমাতে চাইত না বলে মায়েরা সুরে সুরে এসব ছড়া কাটত। বৃহত্তম অর্থে ঘুম পাড়ানি ছড়াগুলি ছেলে ভুলানো ছড়ার অন্তর্গত হলেও শিশুদের ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম, কান্না ইত্যাদি নানা কিছু ছেলে ভুলানো ছড়ার অন্তর্গত। একটি ছেলে ভুলানো ছড়ার অংশবিশেষ নিম্নরূপ -

"ঘুম যারে দুধের বাছা
ঘুম যারে তুই
ঘুমরতন উডিলে বাছা
লই বেরাইয়ম মুই।
সোনার দিয়ম ঢুলইন কোঁডা
রূপার দিয়ম দড়ি
ঢুলইনের বাইর কাইর দি
ঝর পড়েরলে ফোযা ফোডা
বাইরে ভিজের লাই –
দুধের বাছা ঘুম যাদ্দে
সোনার ঢুলইন পাই।"[২২]

বর্তমান সময়ে নানা অসঙ্গতিগুলোকে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়কে ব্যতিক্রম ও রসপূর্ণ ভাষায় যে গানে তুলে ধরা হয় চট্টগ্রামের লোকগানে 'উল্টা বাউলের গান' বলে। এরকম একটি গান -

"আসিল কলির গীত
শুনো ভাই উলটা গীত
উলটা বাবুলের গীত হুনো॥
ওরে জোন পহরগ্যা ধান পুয়াত দি
পাতিলাৎ দিছে বাড়া।
বিলাইরে মাছ কুডাৎ দি
বউয়ে বেড়ায় পাড়া রে॥
উলটা বাবুলের এমন ধারা।"[২৩]

চট্টগ্রামের পল্লি অঞ্চল বন-অরণ্যে সমৃদ্ধ। বনে গাছ কাটা ও চিরানোর জন্য শ্রমিকরা একধরনের শক্তিসঞ্চারী গান গায়, যা 'শ্রমিকদের গান' নামে পরিচিত। শ্রমিকদের গানের নমুনা -

"হে'রে হেঁইয়া
আরও জোরে -হেঁইয়া
আড়াইত্যা বাড়া -হেঁইয়া
কল্লা তোল -হেঁইয়া
আল্লারে আল্লা -হেঁইয়া
আল্লা-রাসুল -হেঁইয়া
জিন্দাগাজী -হেঁইয়া
হযরত আলী -হেইয়া।"[২৪]

চট্টগ্রামের জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার সময়, মাছ ধরে আসার সময়, নদীর পাড়ে জাল বুননের সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের প্রাণে একধরনের গান জাগে। জেলেদের মুখে এই গান 'জেলেদের গান' নামে পরিচিত। নদীর জলে-সাগরের বুকে-ঢেউয়ের তালে তালে তারা এগান করে। জেলেদের মুখে গীত হওয়া একটি গান নিম্নরূপ -

"পুষমাইস্যা শীতের কাল
হাচুঁরি বাইলাম ঢেঁইয়া জাল,
জালে বাজিল ইছা, বাইলা
কোড়াল আর বোয়াল।
কাঁইচার মুখ ডুবারে
এগুে আছে মাছের ঘর
হরাহরি পরিগেল
ছিড়ি যারগোই জাল,
কুতুবদিয়ার উত্তর কোনত
তাইল্যা ফাইস্যা জাগদি থাকে
লড়া পাইলে এ-ক্কাই বারে
ফলর উর ফাল।"[২৫]

ভাটিয়ালি গানকে উত্তর চট্টগ্রামের লোকেরা 'হালদাফাডা গান' বলে। হালদা নদীতে মাঝিরা দাঁড় বেয়ে যাওয়ার সময় এগান গেয়ে থাকে। হালদাফাডা গান একেবারে চট্টগ্রামের নিজস্ব সম্পদ যেখানে সামাজিক পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে -

"মরা বাঘে খওক বন্ধুরে হুয়ানা আলৎ ডুবক
নরম নরম জহিৎ কদু বন্ধে ফুডি মরুক
বন্ধে ভাইরাল রে
নাক ফুল দিয়া কইলা বন্ধু রূপে যে অতুল
বাত্তি জ্বালাই চাইলাম হায় রে বরই গাছের ফুল
বন্ধে ভাইরাল রে"[২৬]

'ফুলপাঠ গান' চট্টগ্রামের ডোম ও জেলেদের নিজস্ব সৃষ্টি। ফুলপাঠ গানের মূল আকর্ষণ হল নাচ আর গান। হিন্দুদের মধ্যে কারও সন্তান-সন্ততি না হলে, তার কোলজুড়ে সন্তান আসার জন্য এ-গান মানত করা হত। এ গানের অংশবিশেষ -

"এক মাসের কালে যাদু গোপনে রাখিল,
দুই মাসের কালে যাদু রক্ত গোলা গোলা,
তিন মাসের কালে যাদু তিন উদর অঙ্গুরী,

চারি মাসের কালে যাদু হাড়ে মাংস জোড়া,
পাঁচ মাসের কালে যাদু পঞ্চফুল ফুটিল,
ছয় মাসের কালে যাদু উলটে পুলটে,
সাত মাসের কালে যাদু সাত করইয়া খায়,
অষ্ট মাসের কালে যাদু মোকাম হয়,
নয় মাসের কালে যাদু নব দন্ডতিথি,
দশ মাসের কালে যাদু উদরে বসতি,
দশ মাস দশ দিন যেদিন পূর্ণ হইল,
উঃহু মাঁহু করি যাদু কাঁদিতে লাগিল।"[২৭]

সারিগানকে চট্টগ্রামের লোকেরা হাইল্যা সাইর বলে। চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় হাইল্যা সাইরকে পাইন্যা সাইর বলে আখ্যায়িত করে। আবার কোথাও কোথাও কৃষকের গান বলতে শুনা যায়। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে ধানের চারা রোপণের সময় দলবদ্ধ হয়ে এ গান পরিবেশন করে। দু'দলে বিভক্ত হয়ে এগান পরিবেশন হয় বলে দল দুটোতে একজন করে মূল গায়ক বা কবিয়াল থাকে। দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাদের গানের সুরে ওঠে এসেছে এভাবে -

"ওরে পশ্চিম সিপাই
তেরজুরি মারি যারগই রঙ বাত্তি জ্বালাই॥
সাথে লইয়া হাতি, ঘোড়া, কামান, বন্দুক যত
সোনা চান্দি টেঁয়া পয়সা লইয়ে শত শত॥
বিটিশের ফাইজলামি হই গেইয়ে শেষ
পাড়া পড়শী মনে গরের স্বাধীন অইয়ে দেশ॥"[২৮]

মাইজভাণ্ডারী গানের উদ্ভবের আগে চট্টগ্রামের মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা বৈষ্ণব পালার ঢঙে অসংখ্য মারফতি গান রচনা করেন। মারফতি গানের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির স্তুতি ও রহস্য প্রকাশ করা হয়। এ ধারায় মারফতি গানের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হলেন আনোয়ারা থাকার ওষখাইন গ্রামের সাধক কবি আলী রজা ওরফে কানু ফকির। তিনি তিনশোর অধিক মারফতি গান রচনা করেন -

"আলো ভবের মাঝে রে
কানুর মন মজিলরে
চল কানু এবে দেশে যাই॥
কোথায় আছিলা মন, কোথায় তোমার সিংহাসন
কোথায় থাকি দিলা দরশন
দরশন দিয়ারে, কোথায় ছাপাই রইলা রে, অ সাধু ভাই
অকূল দরিয়ার মাঝে ভাসাইলা রে॥"[২৯]

'গাজির গান' চট্টগ্রামের মানুষের লোকবিশ্বাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ছিল। তাদের বিশ্বাস গাজি এক গায়েবি পীর। ধর্মযুদ্ধে যারা লড়াই করে বীরত্ব দেখায় তারা গাজি, তাই গাজির গান বীরত্বব্যঞ্জক গান। এতে লড়াইয়ের বর্ণনা, শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণিত। গাজির গানে গাজির কীর্তিগাথা, পরাজিত হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু মেয়ের বিয়ে কিংবা ডাকাতের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী বা নানা উপকথা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামের মানুষের কাছে গাজির গান এলাকাভেদে গাইনের তামাশা, গাইনের পালা নামে সুপরিচিত ছিল। চট্টগ্রামের প্রচলিত একটি গাজির গানের কিছু অংশ নিম্নরূপ-

"সারাদিন যে যুদ্ধ হইল মগ-মুসলমানে
বেলার শেষে কালো মেঘ উড়ে হাইড়া কোনে॥

ধীরে ধীরে সেই মেঘ আসমান ছাইল।
ঝাপটাইয়া তুফান এক উত্তর থনে আইল॥
বেবান সাগরে তখন হৈল বিষম হাল।
চাইর দিকতুন ডাক পৈল সামাল সামাল।
উপরে উঠিছে ঢেউ আকাশ বরাবর
নীচের দিকে পড়ে যেন পাতালের ভিতর॥"[৩০]

উল্লিখিত ধারাগুলো ছাড়াও চট্টগ্রামের আরো কিছু ধারার প্রবহমানতা ছিল। চট্টগ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে 'কীর্তন' নামে এক ধরনের ধর্মীয় গানের প্রচলন যেমন ছিল ঠিক তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল কাওয়ালি, গজল, হামদ্ নাত্, মুর্শিদি ইত্যাদি। এধরনের গানগুলো 'ভক্তিগীতি', 'ভাবের গান', 'আধ্যাত্মিক গান' নামে পরিচিত ছিল। নব্বই দশকের সূচনালগ্নে মাজার কেন্দ্রিক 'মোহছেন আউলিয়ার গানে'র ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া চট্টগ্রামের মাজারগুলো ভিক্ষুকদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব মাজারগুলোতে তারা এককভাবে বা দলবেঁধে গান গেয়ে ভিক্ষা করে যা 'ভিক্ষুকের গান' কিংবা 'ফকিরের গান' নামে পরিচিত।

Reference:

১. সাদী, মোহাম্মদ শেখ, চট্টগ্রামের লোকগান লোককবি: ভাবসাধনার বৈচিত্র্য-সন্ধান, নন্দন বইঘর, চট্টগ্রাম, ২০২০, পৃ. ২৮
২. ঘোষ, কল্যাণী, (সংকলন ও সম্পাদনা), চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৮
৩. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৭৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৫. সাদী, মোহাম্মদ শেখ, চট্টগ্রামের লোকগান লোককবি: ভাবসাধনার বৈচিত্র্য-সন্ধান, নন্দন বইঘর, চট্টগ্রাম, ২০২০, পৃ. ২৮
৬. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৬৯
৭. হায়দার, নাসির উদ্দিন (সম্পাদিত), আবদুল গফুর হালী'র চাটগাঁইয়া নাটক সমগ্র, সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, ২০১৫, পৃ. ৮৮
৮. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৬৩
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
১০. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩২৯
১১. জাহাঙ্গীর, ড. সেলিম (সম্পাদিত), রমেশ শীল: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, আলোকধারা বুকস, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৩৩২
১২. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩৬৯
১৩. আরেফিন, শামসুল, বাংলাদেশের লোককবি ও লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড), বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০৭, পৃ. ২৬
১৪. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৫৫
১৫. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৯৩
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
১৭. ডালিম, শফিউল আযম, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে বিধৃত লোকজীবন, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ৫৭-৫৮
১৮. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ২২৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
২৬. আলম, ওহীদুল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৫
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২৮. উদ্দিন, জামাল, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ৩৯০
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭